সেরা রহস্য
সেরা অ্যাডভেঞ্চার

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

সেরা রহস্য!!

- ড্রাগন! ভীষণ দর্শন এই অজানা জীবটিকে নিয়ে বিভিন্ন দেশে রচিত হয়েছে কত না কল্প-কাহিনী, অ্যাডভেঞ্চার! সত্যিই কি তার অস্তিত্ব আছে? ...

ড্রাগন কি সত্যিই আছে ৯

- কোটি কোটি বছর আগের পৃথিবী। তখন বাস করতো অতিকায় ভয়ঙ্কর ডাইনোসরকুল। প্রাগৈতিহাসিক দুনিয়ার এক সকালে ওরা মেতে উঠেছিল মরণ খেলায়!...

একটি প্রাগৈতিহাসিক সকাল ১৪

- উনবিংশ শতকের এক শখের বিজ্ঞানীর বিশ্বাস ছিল পৃথিবীর ভেতরটা নাকি ফাঁকা! সেখানে আছে অন্য এক প্রাণী জগৎ। তিনি কি যেতে পেরেছিলেন সেখানে!...

পৃথিবীর ভেতরে অন্য পৃথিবী ২০

- প্রাচীন কাল থেকেই মৎসকন্যাদের নিয়ে শোনা গেছে নানা কিংবদন্তি। তাদের শরীরের ওপরের অংশ মেয়ের আর বাকি অংশ মাছের! কেউ কি দেখেছে তাদের? ...

মৎস্যকন্যা—বাস্তব না কল্পনা? ২৩

- বরফ-ঢাকা হিমালয়ের বুকে নাকি ঘুরে বেড়ায় অতিকায় ইয়েতিরা। আসলে ওরা কারা! ওই তুষার মানবদের রহস্য সমাধান কি হয়েছে?

ইয়েতির কিংবদন্তি বিশ্ব জুড়ে ৩১

- কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের অনেক আগেই নাকি ওই ভূখণ্ডে পৌঁছে গিয়েছিল অন্য একদল অভিযাত্রী। তারা কারা? ...

আমেরিকা আবিষ্কারের অজানা কথা ৩৬

- ড্যানিয়েল ডিফো তাঁর বিখ্যাত 'রবিনসন ক্রুসো' উপন্যাসের কাহিনী পেয়েছিলেন এক বাস্তব চরিত্রের জীবনপঞ্জী থেকে! কে সেই আসল রবিনসন? ...

রবিনসন ক্রুসো আসলে কে ছিল ৪১

- ধূধূ সাহারা মরুভূমি নাকি এককালে শষ্যশ্যামল জনবসতি ছিল! তার নিদর্শন আজও ছড়িয়ে আছে সেখানে। কি সেই নিদর্শন? ...

সাহারা যেদিন সবুজ ছিল ৪৭

- জঙ্গলের মধ্যে প্রজাপতির পেছনে ছুটে হেনরি মুড এ কোন জায়গায় এসে হাজির হলেন। সামনে সুন্দর স্থাপত্য। জনমানবহীন। কবে কারা গড়ে তুলেছিল? কেন ছেড়ে চলে গেল?...

হারানো স্থাপত্য ৫১

- প্রাণীজগতে ওদের আবির্ভাব মানুষের অনেক আগে। প্রকৃতির কিছু প্রতিবন্ধকতা না থাকলে ওরাই হতে পারতো মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী। ওরা কারা? পারলো না কেন? ...

যারা মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারতো ৫৫

সেরা অ্যাডভেঞ্চার !!

❑ গত শতকের গোড়ার দিকে আমেরিকার এক বেতারকেন্দ্র ঘোষণা করলো মঙ্গলগ্রহের প্রাণীরা পৃথিবী আক্রমণ করেছে। মানুষ আতঙ্কে দিশাহারা। কীভাবে রক্ষা পেল পৃথিবী? ...

বেতার আতঙ্ক ৬০

❑ অনন্ত মহাবিশ্বে আমরা কি সত্যিই নিঃসঙ্গ? উড়ন্ত চাকিরা কোথা থেকে আসে? কবে মহাকাশ থেকে ভেসে আসবে ভিনগ্রহীদের সংকেত? ...

অন্য গ্রহে কি প্রাণ আছে ৬৪

❑ সেদিন খিদের আগুনে জ্বলতে শুরু করেছিল সারা বাংলা। এমন দিন যেন আর কখনও না আসে! ...

আজও ভুলিনি ৭০

❑ বাঙালির প্রিয় রসাল ফল আম। একে ঘিরে আছে নানা রসাল গল্প আর ইতিহাস। রসে টইটম্বুর !

আমটি আমি খাব পেড়ে ৭৫

❑ আশ্চর্য কল্পবিজ্ঞানের

১। নেশা ৭৯
২। দধীচি ৮৯

❑ স্যার সত্যপ্রকাশের

৩। ভাসমান উপত্যকার রহস্য ৯৮
৪। অণুবীক্ষণ দুনিয়ায় স্যার সত্যপ্রকাশ ১০৪

❑ রহস্যভেদী মেঘনাদের

৫। রহস্যভেদীর জবাব নেই ১২৯
৬। চিল্কার চিংড়ি বিভীষিকা ১৩৭

❑ অশরীরি আতঙ্কের

৭। ভুতুড়ে কেল্লার রহস্য ১৫৭
৮। দু পাটি জুতো ১৬৪

❑ গৌরবময় অতীতের

৯। এক যে ছিল মন্ত্রী ১৭০
১০। এ আমার এ তোমার পাপ ... ১৭৮

❑ মুক্তিযুদ্ধের

১১। রক্ত তলোয়ার ২০২
১২। বিদ্রোহ বহ্নি ২৩০

❑ স্মরণীয় জীবনের

১৩। মা আমি অমল ২৫৮
১৪। উষার আলো ২৬৩

❑ অনাবিল কৌতুকের

১৫। সতেরো ঘোড়সওয়ারের ভূত..২৭৪
১৬। ডাইনোসোর পুষলেন শিবুখুড়ো ২৭৯

ড্রাগন! ভীষণ দর্শন এই অজানা জীবটিকে নিয়ে বিভিন্ন দেশে রচিত হয়েছে কত না কল্প-কাহিনী, অ্যাডভেঞ্চার! সত্যিই কি তার অস্তিত্ব আছে ? ...

ড্রাগন কি সত্যিই আছে

ড্রাগন! ভীষণ-দর্শন অজানা এই জীবটিকে নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই লেখা হয়েছে কত না কল্পকাহিনী, রূপকথা আর অ্যাডভেঞ্চার। আমাদের বাংলাতেও বিভিন্ন লেখকের কল্পকাহিনীর বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে ড্রাগন।

সরীসৃপ শ্রেণীর এক অতিকায় জানোয়ার নাকি ড্রাগন। যেমন দানবের মতো তার আকৃতি, তেমনই অদ্ভুত তার আচরণ। মুখ থেকে অবিরাম আগুনের হলকা বেরোতে থাকে আর নিশ্বাস থেকে ছড়িয়ে পড়ে বিষের ধোঁয়া। যখন গর্জন করে, তার আওয়াজে পাহাড়ে পর্যন্ত ধস নামে।

বিদেশি লেখায় তো ড্রাগনের ছড়াছড়ি। শুধু চিন-জাপানেই এ-নিয়ে রূপকথা আছে ভূরি-ভূরি।

পৌরাণিক, অতিপ্রাকৃত ড্রাগনের ভাবরূপকে সায়েন্স ফিকশন ও রোমাঞ্চকর নানা গল্পের বিষয়বস্তু করে পরিবেশন করেছেন বিদেশি লেখকেরা। ইয়ান ফ্লেমিং-এর জেমস বন্ড সিরিজের 'ডক্টর নো'র কথা মনে পড়ছে। সেখানে একটা দ্বীপে নাকি এক ভয়ঙ্কর ড্রাগন ঘুরে বেড়াত। ড্রাগনের মুখের আগুন আর গর্জন অনেকেই শুনেছে। তাই সাধারণ লোক সে-দ্বীপের কাছে ঘেঁষত না। আসলে সেটি ছিল এক শয়তানের কারখানা। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় মিথ্যে ড্রাগনের বিভীষিকা সৃষ্টি করে অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের দ্বীপ থেকে দূরে রাখা হত।

জুলে ভার্নের কল্পবিজ্ঞান-সাহিত্যেও আছে ড্রাগন নিয়ে এই ধরনের কাল্পনিক ছবি। এ ছাড়া বেশ কিছু কাহিনী এবং চলচ্চিত্র বিদেশে তোলা হয়েছে যার অন্যতম চরিত্র ড্রাগন বা এই জাতীয় জীব।

তবে কল্পবিজ্ঞানে ড্রাগনের এক বিশেষ ভূমিকা হল কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় ড্রাগন সৃষ্টি করা হয়—অন্যের চোখ ধুলো দেবার প্রচেষ্টা হিসেবে। এ ছাড়াও ড্রাগনের আরও অনেক ভূমিকা আছে। এমনকী, আজকাল বহির্বিশ্বে অন্য গ্রহেও ড্রাগনের মতো প্রাণীকে রেখে কাহিনী রচনা শুরু করেছেন কল্পবিজ্ঞানের লেখকরা।

তা হলে কি ড্রাগন নিছকই কল্পনা? এ-ধরনের কোনও প্রাণীর অস্তিত্বই কখনও পৃথিবীতে ছিল না?

● ড্রাগন ঃ কিংবদন্তি ও গল্প কথা

ড্রাগন সম্পর্কে মানুষের কল্পনাচারিতা বহু যুগের পুরনো। বলা যেতে পারে সভ্যতার আদি লগ্ন থেকেই পৃথিবীর কোনো-কোনো অঞ্চলের মানুষের মনে ড্রাগন সম্পর্কে কিছু ধারণা এবং বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে।

সে-বিশ্বাসের সূত্র খোঁজার আগে কিংবদন্তির ধরন সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নেওয়া যেতে পারে।

এ-ব্যাপারে কিন্তু পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম দেশগুলিতে বিশ্বাসের কিছু মূলগত তারতম্য আছে। পশ্চিমের দেশগুলিতে ড্রাগন হল ভয়ঙ্কর অশুভ শক্তির দূত। তার আবির্ভাবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুর্ভাগ্য আর ধ্বংসের ইঙ্গিত। অপরপক্ষে প্রাচ্য দেশগুলিতে ড্রাগনকে জল, হাওয়া এবং প্রকৃতির উর্বরা শক্তির প্রতীক বলে মনে করা হয়। কোরিয়ায় তো প্রত্যেক নদী এবং জলাশয়কে ঘিরেই একটি করে ড্রাগনের গল্প প্রচলিত। অনেকটা আমাদের

দেশের বনদেবীর মতো। চিনের উত্তর আর মধ্য অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকেই ড্রাগন অতি পবিত্র। বৃষ্টির দেবতা ড্রাগনের নিশ্বাসেই নাকি আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়। শুধু কি তাই, এমন বিশ্বাসও প্রচলিত ছিল যে, জল-স্থল-অন্তরীক্ষে ড্রাগনদের মধ্যে যখন লড়াই বাঁধে তখনই জল ফুলে উঠে বন্যার সৃষ্টি হয়, তাদের পায়ের চাপে মাটি কেঁপে উঠে ভূমিকম্প হয়, আর আকাশে যখন যুদ্ধ চলে তখন তাদের সে হুঙ্কারই নাকি বাজের গর্জন রূপে শোনা যায়।

ড্রাগনের আকার এবং রঙের বৈচিত্র্যও কি কম? প্রাচীন চিনা-বিশ্বাস অনুযায়ী কালো রঙের ড্রাগন ধ্বংস ও বজ্রের স্রষ্টা, হলুদ ড্রাগন সৌভাগ্য আর আশমানি রঙের ড্রাগন কোনো মহাপুরুষের জন্মের বার্তা বহন করে। এই প্রসঙ্গে চিনের বিখ্যাত দার্শনিক এবং ধর্মপ্রচারক কনফুসিয়াসের জন্মের সময়ের একটা চালু গল্পের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর জন্মের আগে তাঁর মা নাকি এক আশমানি রঙের ড্রাগনকে ঘরে ঢুকতে দেখেছিলেন।

ড্রাগনরা নানা মায়া-রূপও ধরতে জানে। ইচ্ছেমতো আকার বদলাতে পারে। অদৃশ্য হতে পারে, আবার অন্ধকারের বুকে অগ্নিশিখার মতো জ্বলতে পারে। আকারেও মৌমাছি থেকে আকাশছোঁয়া বিশাল হতেও অসুবিধে নেই। অনেকটা আমাদের রামায়ণের হনুমানের মতো আর কি। অশোক বনে বন্দিনী সীতার সন্ধানে হনুমান যখন স্বর্ণলঙ্কায় প্রবেশ করেছিল, নিজের আকারকে করেছিল মাছির মতো ক্ষুদ্র, তারপর যখন রাবণ তাকে ধরে তার ল্যাজে আগুন জ্বেলে ছেড়ে দিলেন, তখন সে বিশাল আকৃতি ধারণ করে ল্যাজের আগুনে স্বর্ণলঙ্কা ছারখার করেছিল। হনুমান যদিও ড্রাগন ছিল না, তবু তার এই আকার পরিবর্তনের ব্যাপারটার সঙ্গে প্রাচীন চিনের ড্রাগনের কল্পনার কোথায় যেন একটা মিল রয়ে গেছে।

এই প্রসঙ্গে চিনে আগেকার দিনে প্রচলিত এক ধরনের দেশি চিকিৎসার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই চিকিৎসায় নাকি ড্রাগনের হাড় থেকে নানা দুরারোগ্য ব্যাধির অব্যর্থ ওষুধ তৈরি করা হত। পরবর্তীকালে অবশ্য পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যাকে ড্রাগনের হাড় বলে সেই চিকিৎসকরা প্রচার করতেন, আসলে তা ছিল কোনো প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের ফসিল।

এ তো গেল এদিককার কথা। পৃথিবীর পশ্চিম ভূখণ্ডে কিন্তু ড্রাগন সম্পর্কে বেশ একটা ভীতিকর ধারণা প্রচলিত ছিল।

মাংসাশী ড্রাগনের দল সমুদ্রের নীচে ঘুরে বেড়ায়। কখনও-কখনও সমুদ্রের বুকে প্রলয় সৃষ্টি করে ডুবিয়ে দেয় বড় বড় জাহাজ আর অসহায় ভাসমান মানুষগুলিকে টপাটপ খেয়ে ফেলে। শুধু তাই নয়, যুগ যুগ ধরে তারা যক্ষের মতো পাহারা দিয়ে চলেছে বিভিন্ন সময়ে জাহাজডুবিতে সমুদ্রের গভীরে তলিয়ে যাওয়া ঐশ্বর্য এবং সম্পদ। কোথাও কোথাও আর-এক জাতের উড়ুক্কু ড্রাগনকে মানুষ নাকি রাতের আকাশে দেখতে পায়, দুর্ভাগ্য, দুর্যোগ অথবা ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ঘনিয়ে আসার আগে।

এ-সবই আসলে গল্প। অলীক কল্পনা মাত্র।

সিগফ্রেড, সিগার্ড, সেন্ট জর্জ, সেন্ট মাইকেল, আর্থার, প্যানসেন্ট প্রভৃতি ইতিহাসের অনেক বিখ্যাত বীরের জীবন সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, তাঁরা নাকি হিংস্র ড্রাগনকে হত্যা করে পৃথিবীর অমঙ্গল দূর করেছিলেন।

এই জাতীয় গল্পের কোনো বাস্তব ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। লন্ডনের সাসেক্স অঞ্চলেও একটা মজার উপাখ্যান চালু ছিল। একটি লোক নাকি ড্রাগনের সঙ্গে বীরের মতো লড়াই করে তাকে কাবু করে ফেলেছিল। তারপর যুদ্ধ-জয়ের আনন্দে ডগমগ হয়ে সেটাকে বন্দী করে বিরাট এক ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে ফিরছিল। কিন্তু রাত্রে হঠাৎ সেই আধমরা ড্রাগন আবার চাঙ্গা হয়ে গাড়ি, ঘোড়া, সহিস, এমনকী আশপাশে যা-ছিল সব খেয়ে হজম করে পালিয়ে যায়।

এমন গালগল্প আরও অনেক পাওয়া যাবে।

ড্রাগনের খাদ্য-তালিকা নিয়েও মাথা ঘামিয়েছেন পশ্চিম দেশে কেউ-কেউ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য ড্রাগনকে মাংসাশী বলা হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর এক ভদ্রলোক, নাম টপসেল, 'হিস্ট্রি অব ফোর ফুটেড বিস্টস' নামে একটি

মজার বই লেখেন। সেই বইটিতে প্রধানত ড্রাগন নিয়েই যা-কিছু গবেষণা ছিল। সেখানে ড্রাগনের খাদ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা নাকি খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে খুবই সতর্ক। বিশেষ করে আপেল জাতীয় ফল তারা একেবারেই খেতে চায় না। কারণ তাতে তাদের শরীরে বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, তারা চটপট অসুস্থ হয়ে পড়ে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ড্রাগন যে শুধু ক্ষতিকর এবং ভয়ঙ্কর তা নয়। বহুকাল আগে রোমান লেখক প্লিনি একটা কাহিনী শুনিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছে, আর্কাডিয়ায় থোয়েস নামে একটি লোকের নাকি একটা পোষা ড্রাগন ছিল। সেই ড্রাগনের সাহায্যেই একদল হিংস্র দস্যুর আক্রমণ থেকে সে রক্ষা পেয়েছিল।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। এইসব কিংবদন্তি এবং গল্পকথা থেকে একটা প্রশ্নই মনে জাগে যে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের মনে ড্রাগন সম্পর্কে এইসব কল্পনা জন্ম নিল কীভাবে? ড্রাগনের মতো জীব পৃথিবীতে সত্যিই কি আছে অথবা কোনোদিন ছিল?

সম্প্রতি কয়েকজন জীববিজ্ঞানী এবং গবেষক এই নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন।

● ড্রাগন এল কোথা থেকে?

এই গবেষক-বিজ্ঞানীরা অনেক অনুসন্ধান চালিয়েও বর্তমান পৃথিবীর বুকে পরিচিত প্রায় ৫ লক্ষ প্রাণীর মধ্যে এই জাতীয় কোনো দানবের অস্তিত্ব খুঁজে পাননি।

এর পর তাঁরা অতীতের দিকে অর্থাৎ বিবর্তনের আদিম লগ্নে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়েছেন।

যুগটার বৈজ্ঞানিক নাম মেসোজয়িক। এ-যুগের সূত্রপাত আজ থেকে ২৩ কোটি বছর আগে এবং শেষ ৬ কোটি ৩০ লক্ষ বছর আগে। এই সময়টিকে আবার তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়—ট্রয়াসিক, জুরাসিক এবং ক্রিটেসিয়াস। এই সময়টায় পৃথিবীর বুকে দাপটে রাজত্ব করত ডাইনোসর নামধারী সরীসৃপের দল। আকার-

আয়তনে এদের এক-একটির যা বাড়বৃদ্ধি ঘটেছিল তাতে তাদের দানবই বলা চলে। সেই হিসেবে এই যুগটাকেই এক দানব-যুগ বলা যায়। পৃথিবীর অবিরাম ভাঙা-গড়ার মধ্যে উদ্ভিদ এবং প্রাণীকুলের আকার এবং প্রকৃতি তখন দুইই ভারী অস্বাভাবিক।

ডাইনোসরদের মূলত দু ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে সরিসচিয়া এবং ওরনিথিসচিয়া। সরিসচিয়া জাতীয় প্রাণীদের পেছন দিকটা ছিল পুরোপুরি সরীসৃপের মতো আর ওরনিথিসচিয়াদের পেছনের হাড়ের সঙ্গে পাখিদের পেছনের হাড়ের মিল আছে।

এদের মধ্যে এক-একটি তো রীতিমতো ভয়ঙ্কর। ব্রন্টেসরাস প্রজাতিটি লম্বায় প্রায় ৬৭ ফুট এবং ওজনে ৩৫ টনের মতো। সরপোড প্রজাতির যে ডাইনোসররা ইচ্ছেমতো জল-স্থল দাপিয়ে বেড়াত তারাও অন্তত ৪৭ ফুট লম্বা তো হতই। এমনই এক কঙ্কাল রক্ষিত আছে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে। এটির ফসিল ১৯৬১ সালে দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী-উপত্যকায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। এটির ওজন প্রায় ৭ টন।

জল-স্থলের মতো পৃথিবীর অন্তরীক্ষেও তখন রাজত্ব করতে শুরু করেছিল ডাইনোসরকুলের অন্য এক শাখা। পাখিদের আদিপুরুষ বলা চলে। এটির বৈজ্ঞানিক নাম টেরোডাকাইলন। আজ থেকে দশ কোটি বছর আগে এরা ডানা বিস্তার করেছিল পৃথিবীর আকাশে।

এদের বীভৎস আকৃতির পক্ষী-রাক্ষসই বলা যায়। ধনেশ পাখির মতো চোয়াল, সরীসৃপের মতো মেরুদণ্ড আর পায়ের নখ ইস্পাতের মতো কঠিন ও ধারালো। ডানা দুটো যেন খুদে দুটি হাতের মতোই। এরই সাহায্যে এরা গিরগিটির মতো চলাফেরা করত। গাছে-গাছে আর ডানা ছড়িয়ে যখন আকাশে উঠত, সে দৃশ্যটা ভাবলে বিশালকায় এক অদ্ভুত জীব ছাড়া আর-কিছু মনে হবে না।

কিন্তু এরা কেউ টিকে থাকেনি। পৃথিবী কাঁপানো এইসব বিকট, ভয়ঙ্কর ডাইনোসর মেসোজয়িক যুগের শেষের দিকেই নানা প্রাকৃতিক কারণে লুপ্ত হয়ে যায়। তাদের বংশধর হিসেবে থেকে যায় শুধু আজকের গোসাপ, গিরগিটি, টিকটিকি জাতের সরীসৃপের দল।

আকার, আয়তন এবং জীবনধারার ব্যাপারে ডাইনোসর গোষ্ঠীর টেরানোসরাস, ব্রন্টেসরাস, সরোপড কিংবা টেরোডকাইলন-এর সঙ্গে ড্রাগনের কল্পনায় কোথায় যেন একটা যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে। তবে মানুষের কল্পনায়

এরই সঙ্গে দেশ বা অঞ্চল ভেদে যুক্ত হয়েছে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য—অগ্নি-উদ্গিরণকারী নিশ্বাসে বিষ, গর্জনে বজ্রের নির্ঘোষ ইত্যাদি। সৃষ্টি হয়েছে অজস্র রূপকথা আর কিংবদন্তি।

তবু একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। তা হল, প্রাচীন মানুষের স্মৃতিতে ডাইনোসরেরা এল কী করে? জীব-বিবর্তনের ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যায় ডাইনোসরকুল পৃথিবীর বুকে ধ্বংস হওয়ার অনেক পরে পৃথিবীতে এসেছে মানুষ। মাত্র কয়েক লক্ষ বছর তার বয়স। তা হলে তো ডাইনোসরদের সঙ্গে মানুষের সাক্ষাৎই ঘটেনি পৃথিবীর বুকে।

এ-ব্যাপারে ভেবেচিন্তে এবং গবেষণা করে কিছু বিজ্ঞানী যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা হল প্রায় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ বছর আগে ডাইনোসরদের বিনাশ ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু তাদের ঠিকানা-ঠিকুজি আজও রয়ে গেছে পৃথিবীর বুকে। পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেছে প্রচুর সংখ্যক ফসিল। এর মধ্যে সেই লুপ্ত অতিকায় প্রাণীদের প্রস্তরীভূত হাড়ের অংশ যেমন আছে তেমনই আছে পায়ের ছাপ। এমনকী, ১৯২০ সালে রয় চ্যাপম্যান অ্যানড্রুজ নামে এক আমেরিকান অভিযাত্রী মোঙ্গলিয়ার মরু অঞ্চলে একই সঙ্গে খুঁজে পেয়েছেন অনেকগুলি ডাইনোসরের ডিমের ফসিল। রীতিমতো চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার। কিছু ডিম ভাঙাচোরা হলেও কয়েকটি একেবারে অবিকৃত। আকারে সেগুলি আধুনিক উট পাখির ডিমের মতো।

এই গবেষকরা যা বলতে চান, তা হল আজকের মতো প্রাচীন কালেও মানুষ খুঁজে পেয়েছিল অতিকায় বিশাল সব হাড়ের ফসিল, পদচিহ্ন কিংবা ডিম। মানুষের চিরকালের কৌতূহল সেদিনও চেয়েছিল এই রহস্যের উত্তর খুঁজতে। কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারায় তখনও পুষ্ট হয়নি মানুষের মন, জীব বিবর্তনের ইতিহাসও অজ্ঞাত। হয়তো এইভাবেই আবির্ভূত হয়েছিল শুভ-অশুভ শক্তির প্রতীক, অগ্নি-উদ্গিরণকারী, ভয়ঙ্কর গর্জনকারী অতিকায় উড়ুক্কু ড্রাগনের দল—যার গতি জল-স্থল-অন্তরীক্ষের সর্বত্রই ছিল অবাধ আর স্বচ্ছন্দ!